মূর্ছনা
==============================
www.MurchOna.com
Archives of eBooks, Music & Videos
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
==
suman_ahm@yahoo.com

পুনরায় ডোডো তাতাই

তারাপদ রায়

১
নতুন করে দেখা

অনেকদিন পরে হঠাৎই ডোডোবাবুর সঙ্গে তাতাইবাবুর দেখা। এতকাল বাদে দুজনই হঠাৎ দুদিক থেকে পুরোনো পন্ডিতিয়া রোডে ঢুকে পড়েছিলেন। পণ্ডিতিয়ায় ঢুকে ডোডোবাবুর মনে পড়ছিল অনেকদিন আগে এখানে ছিলাম। আবার মনে হচ্ছিল এ

জায়গা ছেড়ে তো কোনওদিন যাইনি। মধ্যে তিরিশ বছর সময় কোথায় হারিয়ে গেছে, বৃষ্টিরোদের সঙ্গে মিলেমিশে গেছে।

ডোডোবাবুদের পুরোনো বাসার সামনে এসে তিনি দাঁড়ালেন। সবই ঠিকঠাক একরকম। এমনকি জানলায় নীল পর্দাটা পর্যন্ত। এর মধ্যে সেই কবেকার হুলো বেড়াল কৃষ্ণকান্ত বাড়ির মধ্য থেকে এসে জানলার নীলপর্দা ফাঁক করে তাকে একবার দেখে নিয়ে কোনওরকম আবেগ-উত্তেজনা না দেখিয়ে বাড়ির মধ্যে ফিরে গেল। সামনেই মিশিরজির পানের দোকান। পানটান ছাড়াও সোডা আর লেমনেড পাওয়া যেত। তাছাড়াও লজেন্স, ললিপপ, বিস্কুট, রঙিন লাঠি, লাটিম, বাচ্চাদের যতসব খেলনা।

মিশিরজির কমলালেবু লজেন্স অপূর্ব। একেকটা পাঁচ পয়সা করে। ডোডোবাবু পকেট থেকে একটা টাকা বার করে মিশিরজিকে দিয়ে বলল, এক টাকার কমলালেবু লজেন্স।

মিশিরজি বিনা বাক্য ব্যয়ে দুটো লজেন্স বার করে ডোডোবাবুকে দিলেন।

ডোডোবাবু অবাক। ডোডোবাবুর হিসেবে কুড়িটা লজেন্স পাওয়া যাবে।

এতগুলো বছর মধ্যে থেকে উবে গিয়েছে। এমন সময় দূরে দেখা গেল দ্রুতগতিতে তাতাইবাবু এদিকে আসছেন। তাতাইবাবুর হাতে একটা ছোট গোল আকারের লাল রঙের রবারের বল। সেই পুরোনো দিনের মতো। বলা বাহুল্য, ডোডোবাবু - তাতাইবাবু পরস্পরকে চিনতে একটুও ইতস্তত করলেন না। দুজনেই পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি এখানে ?

তাতাইবাবু সন্দেহ দূর করার জন্যে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ডোডোবাবু তো ?'

ডোডোবাবুও জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাতাইবাবু তো ?'

পরস্পর সৌহার্দ্য বিনিময় করলেন। ডোডোবাবু তাতাইবাবুকে একটা কমলালেবু

লজেন্স দিয়ে আর তাতাইবাবু ডোডোবাবুকে তাঁর হাতের লাল বলটা মিনিটখানেক ড্রপ দিতে দিলেন।

ইতিমধ্যে বাড়ির মধ্যে থেকে কৃষ্ণকান্ত বেরিয়ে এসেছে। সে এসে একবার ডোডোবাবুর পায়ে, একবার তাতাইবাবুর পায়ে পিঠ ঘষছে। আর দূর থেকে তাতাইবাবুর পুরোনো কুকুর গণেশ আবেগে উচ্ছ্বাসে ঘেউঘেউ করছে।

লজেন্স চুষতে চুষতে, বল ড্রপ দিতে দিতে দুই বন্ধু নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, এতদিন চলে গেল, আমরা তো বড় হলাম না। পড়াশোনা করলাম, চাকরি করলাম, এমনকি বিয়ে হল আমাদের। কিন্তু আমরা বড় হলাম না।

‘কৃষ্ণকান্ত, গণেশ, পণ্ডিতিয়া রোড, মিশিরজি, এগুলোর হেরফের হল না।’

দুজনেরই মনের কথা এক। ভাবতে ভাবতে ডোডোবাবু বললেন, ‘কত লোক যে আমাকে বলে আরে ডোডোবাবু কত বড় হয়ে গেছেন।’

তাতাইবাবু বললেন, ‘কত লোক যে আমাকে বলে আরে তাতাইবাবু কত বড় হয়ে গেছেন।’

বলে ড্রপ দিতে দিতে তাতাইবাবু বললেন, ‘একেকজন একেকরকম বড় হয়। কে যে কেমন বড় হবে, কেউ জানে না।’

ডোডোবাবু বললেন, ‘একেবারে ঠিক কথা। এটাই শেষ কথা।’

২
ছুটির দিন

গত শতকে সাতের এবং আটের দশকে বাঙালি শিশুরা চিনত ডোডো-তাতাইকে। তখন বলতে গেলে বাংলার ঘরে ঘরে ডোডো-তাতাই। ওই সময়ে যে শিশুরা জন্মেছিল

তাদের প্রায় অনিবার্য নাম ছিল ডোডো কিংবা তাতাই। এখনও স্বদেশে-বিদেশে অনেক সহাস্য যুবকের সঙ্গে পরিচয় হয় নাম তাতাই আর ভাই অবশ্যই ডোডো।

ডোডো-তাতাই অবশ্য ভাই ছিল না। তারা ছিল একই পাড়ার পাশাপাশি বাড়ির প্রতিবেশী। তাদের নিয়ে এখন আর বেশি ছেলেখেলা করা যাবে না। চল্লিশ ছুঁই ছুঁই এইসব যুবকেরা এখন সমানের গন্যমান্য ব্যক্তি। তাতাইবাবু থাকেন মার্কিন দেশে, ডোডোবাবু কলকাতায়। অবশ্য জীবিকাসূত্রে তাঁকেও বিদেশ যেতে হয়।

একই নদীর জলে দু'বার ডুব দেওয়া যায় না। এতদিন পরে এরকম একটা ধারাবাহিক আরম্ভ করতাম না, যদি না প্রস্তাবটা আসত ইন্টারনেটের আন্তর্জাতিক বাংলা পত্রিকা থেকে। যে পত্রিকা বিদেশে এখন বহুলোক পাঠ করে। তাদের কাছে যদি একটু সাবালক একটু বাকচতুর একালের ডোডো-তাতাইকে পৌঁছে দিতে পারি, সেই আশায় ভরসা করেই এই লেখা।

গল্প কাহিনিতে ভূমিকা হয় না। ভূমিকার সুযোগ থাকে না। এখানে ভূমিকা দিতে গিয়ে ** কাহিনিকে কিঞ্চিৎ খর্ব করে ফেললাম। বর্তমান ডোডো-তাতাইকে পাঠকের কাছে পরিচিত করার জন্যে এটুকু করতেই হবে।

তাতাইবাবুর এখনকার চাকরি সান ফ্রান্সিস্কো শহরে, আমেরিকায়। সেখান থেকে কি একটা কাজে ব্যাঙ্কক এসেছিলেন। কাজ থেকে একটা দিন চুরি করে এবং সেই সঙ্গে সপ্তাহর শেষে শনিবার-রবিবার যোগ করে পর পর চারদিন যোগাড় করলেন তাতাইবাবু। সেই বৃহস্পতিবার বিকেল বিকেল ব্যাঙ্কক থেকে বেরিয়ে রাত সাড়ে আটটা-নটা নাগাদ কলকাতায় এসে পৌঁছলেন। এয়ারপোর্টের ঝামেলা মিটিয়ে ট্যাক্সি করে বাড়ি আসতে আসতে রাত দশটা হয়ে গেল।

দক্ষিণে কলকাতার সেই ভাড়াটে বাড়ি আর নেই। এখন তাতাইবাবুদের বাড়ি হয়েছে লবণহ্রদে। বাড়িতে আগেও যা ছিল, এখনও তাই আছে, বাবা-মা-কাকা। তবে গণেশ নামে যে কুকুরটা পনের বছর ছিল সে কিছুদিন হল মারা গেছে।

নতুন বাড়ি বলে তার শূন্যতাটা বোঝা যাচ্ছে না। তাতাইবাবুও বাড়ি ফিরে এসে গণেশের অনুপস্থিতি টের পাননি।
যাই হোক, বাড়িতে হইচই পড়ে গেল। ঘরের ছেলে প্রবাস থেকে যদি কোনও খবর না

দিয়ে হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়, সে যে কি আনন্দের, কি উত্তেজনার তা বোঝানো সম্ভব নয়।

প্রথমে সবাই আশঙ্কান্বিত হয়েছিল, কি জানি কোনও খারাপ খবর নাকি। পরে যখন জানা গেল হঠাৎ ছুটি, বাড়িতে খুশির হিল্লোল। শুধু বিদেশে পুত্রবধূ এবং দুই পৌত্রীর জন্যে মন কেমন করতে লাগল।

রাতে ডোডোবাবুকে ফোন করা গেল। তিনি তো রীতিমতো উত্তেজিত। প্রায় তখনই আসেন আর কী। পরদিন সকালবেলা গড়িয়ায় তাঁর নিজের ফ্ল্যাট বাড়ি থেকে লবণহ্রদে এসে পৌঁছলেন।

ডোডোবাবু বললেন, 'আজ সারাদিন চুটিয়ে আড্ডা মারা যাবে।'

তাতাইবাবু কাজের মানুষ। তিনি বললেন, 'আজ কি অফিস ছুটি নাকি ?'

ডোডোবাবু বললেন, 'হ্যাঁ। আজ তো জন্মাষ্টমী।

ডোডোবাবুর কথায় তাতাইবাবুর মাথায় কী একটা খেলে গেল। তাতাইবাবু বললেন, 'আচ্ছা ডোডোবাবু আপনার তো এখন বয়স হয়েছে। আপনি বলুন তো শ্রীকৃষ্ণ, যিশুখ্রিস্ট, গান্ধি, রবীন্দ্রনাথ -- এঁদের মধ্যে মিল কোথায় ?'

ডোডোবাবু অনেক চিন্তা করে পকেট থেকে চিরুনি বার করে মাথার চুল শক্ত করে আঁচড়িয়ে বললেন, 'এরা সবাই মহাপুরুষ। সেটাই একমাত্র মিল।'

তাতাইবাবু বললেন, 'ধুত, এই সামান্য প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেন না ?'

ডোডোবাবু বললেন, বেশ রাগতভাবেই বললেন, 'না, পারলাম না। এবার আপনি বলুন।'

তাতাইবাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'এঁরা সবাই ছুটির দিনে জন্মেছেন।'
ডোডোবাবু কিঞ্চিৎ হতভম্ব হয়ে তারপর হো হো করে হেসে উঠলেন।

৩
হাসবে হাসবে

মাত্র তিনদিন হল তাতাইবাবু বাড়িতে এসেছেন। আর মাত্র একদিন বাকি। আগামীকালই বিকেলে ব্যাঙ্ককে, তারপরের দিন সানফ্রানসিস্কোয় কাজের জায়গায় ফিরে যাবেন তাতাইবাবু।

এবার বাড়িতে এসে জমজমাট। মাত্র চারদিনের মেয়াদ, কিন্তু সবসময়ই ডোডোবাবু হাতের কাছে থাকায় তাঁকে নিগৃহীত করতে পেরে মহা উল্লাসে আছে। তাতাইবাবু একেবারে সেই বালক বয়সের মতো। তাঁর কাজের জায়গায় ডোডোবাবুর মতো লোক পাওয়া যায় না। তাছাড়া নতুন চেনা বা আধচেনা লোকের সঙ্গে রসিকতা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, অনেকে সময় বিপজ্জনক।

তাতাইবাবু আসার পরের দিনই কলকাতায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির আন্দোলন, 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ, বন্দেমাতরম'। রাস্তায় মারামারি, পাথর ছোড়াছুড়ি। এসব তো আগেই ছিল, এখন তার সঙ্গে যোগ হয়েছে বোমা-বন্দুক।

পুলিশও সাংঘাতিক হয়ে উঠেছে। কথায় কথায় লাঠি-চার্জ আর সে কী বেধড়ক লাঠি চার্জ, যার টিভি দেখেন তারাই জানেন।

মাটিতে পড়ে যাওয়ার পরেও প্রবল শক্তির সঙ্গে পিটিয়ে যাচ্ছে। অনেক সময় এতেও হয় না, তখন মারমুখী জনতার ওপরে পুলিশ লাফিং গ্যাস চালায়। অবশেষে তাতেও কাজ না হলে পুলিশ গুলিও চালায়।

এই পর্যন্ত আলোচনার পর তাতাইবাবু সরলভাবে ডোডোবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা আপনার ওই লাফিং গ্যাসটা কি ?'

ডোডোবাবু বললেন, 'একরকমের কাঁদানে গ্যাস জাতীয় জিনিস কিন্তু কাঁদানে গ্যাসে যেমন চোখ দিয়ে জল পড়ে, তেমনই লাফিং গ্যাসে লোকে হাসতে থাকে।'

তাতাইবাবু যেন এসব কথা নতুন জানছেন এরকম সরলভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তাই নাকি ?’

তারপর হঠাৎ কথার মোড় ঘুরিয়ে ডোডোবাবুকে বললেন, ‘আচ্ছা, আপনার রামগরুড়ের ছানার সঙ্গে আলাপ আছে ?’

ডোডোবাবু হঠাৎ বালকদিনের মতো চেঁচিয়ে উঠলেন, ‘দেখুন তাতাইবাবু, সব জিনিসের একটা সীমা আছে। আপনি আমেরিকায় থাকেন বলে যা নয় তাই বলবেন ?’

তাতাইবাবু বললেন, ‘যা নয় তাই আবার কী হল ?’

ডোডোবাবু বললেন, ‘আপনি আমাকে রামগরুড়ের ছানা বললেন।’

তাতাইবাবু বললেন, ‘আমি একটা জিনিস ভাবছিলাম, একটা মানুষের ওপরে যদি লাফিং গ্যাস আর কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ করা হয়, তাহলে ?’

প্রশ্নটা অপমানসূচক কিনা ঠাহর করতে না পেরে ডোডোবাবু মুখ বন্ধ করে দাঁত কিড়মিড় করতে লাগলেন। যেন আবার অল্পবয়সে ফিরে গেছেন।

তারপর বললেন, ‘রামগরুড়ের ছানা কিন্তু মানুষ নয়। সে কখনওই হাসবে না। লাফিং গ্যাস -- কাঁদানে গ্যাস একসঙ্গে নিলেও না।

তাতাইবাবু বললেন, ‘কিন্তু যদি জোর করে ধরে কাতুকুতু দেওয়া হয় তাহলে ?’

ডোডোবাবু আর ধৈর্য ধরতে পারলেন না। তার পক্ষে হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হয়ে পড়ল। তিনি হো হো করে হাসতে লাগলেন। হাসতে হাসতে বললেন, ‘হাসবে, হাসবে, হাসবে।’

৪
হানুয়ারিতে মেহিকো

আবার অনেকদিন পরে তাতাইবাবু বিদেশ থেকে এসেছেন। স্বাভাবিকভাবেই প্রাণের বন্ধু ডোডোবাবু তাতাইবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাতাইবাবু তখন সুটকেশ খুলে সকলের জন্য যা যা উপহারসামগ্রী এনেছেন তা বিলি ব্যবস্থা করছেন।

ডোডোবাবুকে দেখে সুটকেসের নিচ থেকে একটা হাফ-জ্যাকেট বার করলেন। সেটার গায়ে নানারকম রঙিন সুতোর জরি দিয়ে বিচিত্র নকশা। পিঠে একটা ভূতের মতো মানুষের কালো প্রিন্ট।

তাতাইবাবু অদ্ভুত পোশাকটি ডোডোবাবুকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনার জন্যে এনেছি। আপনাকে খুব ভাল মানাবে।'

ডোডোবাবু একটু ইতস্তত করে অদ্ভুত পোশাকটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এটা আবার কী ?'

ডোডোবাবুর বলার ভঙ্গিটা তাতাইবাবুর ভাল লাগল না। তিনি বললেন, 'এটা একটা আপনাদের জহরকোটের মতো জিনিস। জহরকোটের মতো সাদামাটা নয়, দেখছেন না কিরকম আদিম কারুকাজ ?'

ডোডোবাবু সংক্ষিপ্তভাবে পুনরুক্তি করলেন, 'আদিম ?'

তাতাইবাবু বললেন, 'হ্যাঁ আসল মেহিকান জিনিস।'

আবার সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ডোডোবাবুর, 'মেহিকান ?'

তাতাইবাবু পণ্ডিতের মতো বললেন, 'ওই মেহিকান মানে মেক্সিকান। মেক্সিকো ভুল উচ্চারণ, মেহিকো হল আসল কথা। যেমন স্যান জোস হল স্যান হোস, ভ্যালেজো হল হ্যালেহো।'

ডোডোবাবু এবার কোটটা হাতে নিয়ে বললেন, ‘সে যা হোক, এটা কী জিনিস ?’

তাতাইবাবু বললেন, ‘বুঝতে পারছেন না ? এটা আপনার জন্যে। আসল ভেড়ার লোম দিয়ে তৈরি।’

ডোডোবাবু একটা বোকামি করলেন। কথার পিঠে কথা বলতে গিয়ে বললেন, ‘ভেড়া আবার আসল-নকল হয় নাকি ?’

তাতাইবাবু চটে গিয়ে বললেন, ‘তা হবে না কেন ? এই তো আমার সামনেই একজন আসল ভেড়া বসে আছেন।’

উপহার পেয়ে ডোডোবাবুর মনটা একটু ভাল হয়েছে। তিনি এই কটুক্তির প্রতিবাদ না করে বললেন, ‘এটা পরলে শরীর গরম থাকবে তো ?’

তাতাইবাবু বললেন, ‘নিশ্চয়ই থাকবে। তবে গরমের দিনে পরতে যাবেন না। গায়ে ফোস্কা পড়বে। একেবারে পাগল হয়ে যাবেন।’

ডোডোবাবু বললেন, ’এ জিনিস আমি কলকাতায় ব্যবহার করব না। এটা আমি খোদ মেহিকোয় গিয়ে গায়ে চড়াব।

তাতাইবাবু যেন একটু বোকা বনে গেলেন। বললেন, ‘মেহিকো ? আপনি কবে মেহিকো যাচ্ছেন ?’

ডোডোবাবু বললেন, ‘এই সামনের হানুয়ারিতে।’

‘--হানুয়ারি ?’ তাতাইবাবু স্তম্ভিত।

ডোডোবাবু বললেন, ‘ওই আপনারা যাকে জানুয়ারি বলেন।’

৫
গাধাসার

তাতাইবাবুর পাঁচদিনের ছুটি দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেল। আজ চতুর্থ দিন। কালকে সন্ধ্যাতে দমদম বিমানবন্দরে সিঙ্গাপুরের প্লেন ধরতে হবে।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা ডোডোবাবু এলেন তাতাইবাবুকে বিমানবন্দরে পৌঁছে দিতে। তাতাইবাবুর সঙ্গে মালপত্র খুবই কম। যাকে বলে পেশাদার ভ্রমণকারী, বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়া কিছু বহন করেন না।

যা হোক, বিমানবন্দরে রীতিমতো ভিড়। এখান থেকে পূর্ব ভারতের এমনকি বাংলাদেশের বহু লোক সিঙ্গাপুর হয়ে জাপান, আমেরিকা এমনকি ইউরোপেও যায়।

হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে এক ভদ্রলোকের দিকে চোখ পড়তে ডোডোবাবু তাতাইবাবুকে বললেন, ওই দেখুন, গাধাসার বসে আছেন। শুনে তাতাইবাবুর মনে হল গাধাসার কথাটার মানে একসময় জানতেন।

একটু পরেই মনে পড়ল ইস্কুলে তিনি কী একটা প্রশ্নের ভুল জবাব দিয়েছিলেন। তাই শুনে ইতিহাসের শিক্ষক মহোদয় তাঁকে গাধা বলেছিলেন। তার চেয়েও বেশি বলেছিলেন যে, তুমি কি এই ক্লাসের টিচার নাকি ? যা নয় তাই বলছ !

তাতাইবাবু বিনীতভাবে বলেছিলেন, ভুল হয়ে গেছে সার। তখন ক্ষমা করে দিয়ে যাব। বলেছিলেন, তাহলে চুপ করে থাকো, আমাকে বলতে দাও।

সেই অবধি ইতিহাসের মাস্টারমশাই ছাত্রদের কাছে গাধাসার হয়ে গেলেন।

আজ কিন্তু বিমানবন্দরে গাধাসারকে দেখে তাতাইবাবুর খুব ভাল লাগল। ডোডোবাবু, তাতাইবাবু দুজনে গিয়ে মাস্টারমশাইকে প্রণাম করলেন। মাস্টারমশাই বললেন, তিনি সানফ্রান্সিস্কো যাচ্ছেন। তাতাইবাবু বললেন, আমিও সানফ্রান্সিস্কো। আপনার কোনও অসুবিধা হবে না। মাস্টারমশাই খুব খুশি হলেন। একা একা যেতে তাঁর

একটু ভয় ভয় করছিল। তাতাইয়ের মাথায় হাত রেখে বললেন, বাবা, তুমি খুব ভাল ছেলে। যেমন বিদ্যা তোমার, তেমনই বুদ্ধি।

৬
পাগল

কালীপুজোর মুখোমুখি তাতাইবাবু বাড়িতে এসেছেন। মাত্র চার-পাঁচদিনের ছুটি। তাঁর অফিসের একটা কাজ ছিল ম্যানিলাতে। তারপরে দিল্লিতে একটা সেমিনার।

তাতাইবাবুকে চাকরির কাজে সারা বছরই নানারকম জায়গায় ঘুরতে হয়। তবে নিজের দেশ ভারতবর্ষে আসার সুযোগ কম।

তাতাইবাবু যে সংস্থায় কাজ করেন তাদের খুব একটা কাজ এদেশে নেই। ফলে খুব একটা আসা হয় না। তবে এবারের আসার ব্যাপারটা একটু আলাদা। অফিসের কাজে এসেছেন। তাই একা এসেছেন। বউ মেয়েরা কেউ সঙ্গে আসেনি।

তাতাইয়ের মা অবশ্য নাতনিরা না আসায় খুব দু:খিত হয়েছেন। এবং তাতাইবাবুর ওপর বেশ চটে গেছেন।

তাতাইবাবুর তাতে কিছু আসে যায় না। তিনি মহা ফুর্তিতে আছেন। ডোডোবাবুকে ফোন করেছেন। ডোডোবাবু তাতাইবাবুর ফোন পেয়ে মহা খুশি। অফিসে ছুটি নিয়ে নিলেন।

ডোডোবাবু আসতেই তাতাইবাবু হইহই করে বেরিয়ে পড়লেন। কালীপুজোর বিকেল। চারদিকে বাজি, পটকার ধোঁয়ায়, আলোয়, গন্ধে আচ্ছন্ন।

ছোটবেলার নানা কথা দুজনে মিলে বলতে লাগলেন। তাতাইবাবুরা যত বড় রাস্তার দিকে এগোন, তত ভিড়। লোকজন ছুঁচোবাজি থেকে হাউই, আতশ হাজার রকমের আলোর খেলা। এত হই-হট্টগোল এই বয়সে ভাল লাগছিল না।

তাতাইবাবু বললেন, আমরা অল্প বয়সেও এরকম দেখিনি। ডোডোবাবু বললেন, যা দেখেননি, তা দেখেননি। এবার রাস্তার ওদিকে দেখুন।

রাস্তার ওদিকে দেখা গেল, দুই ব্যক্তি একটা গলির দুপাশের মুখে দাঁড়িয়ে কী ছোড়াছুড়ি করছে। তাতাইবাবু বললেন, এটা কী হচ্ছে ? ডোডোবাবু বললেন, এরা পাগল হয়ে গেছে। তাতাইবাবু অবাক হয়ে বললেন, পাগল ? ডোডোবাবু বললেন, হ্যাঁ, পাগল। প্রত্যেকবার পুজোর মরসুমে এঁরা পাগল হয়ে যান।

তাতাইবাবু বললেন, প্রমাণ ? ডোডোবাবু বললেন, ওই ডানদিকের ভদ্রলোক একটার পর একটা পাঁচশো টাকার নোট গলির এদিকে ছুড়ে ফেলছেন। আর গলির ওদিকের ভদ্রলোক সেই নোটগুলো যত্ন করে একটার পর একটা কুড়িয়ে আনছেন। এই যে ঘটনা এটা কি প্রমাণ করে না এঁরা দুজনেই ডাহা পাগল ?

৭
পরে জন্মেছিলাম

রাতে কালীপুজো দেখা অসম্ভব কাজ। যেমন ভিড়, তেমনই ছুঁচোবাজির আচমকা আক্রমণ। মাথায় আতশ কিংবা বিপথগামী হাউই বাজির কুচি পড়া, এছাড়াও ভিড়, ঠেলাঠেলি।

অল্প কয়েকদিনের ছুটিতে এসে তাতাইবাবুর ইচ্ছা হচ্ছিল না সন্ধেটা ভিড়ে ভিড়ে নষ্ট করার। দু-চারজন পুরোনো বন্ধুবান্ধব এসেছিল। তাতাইবাবুর মা সেই পুরোনো দিনের মতো সবাইকে বোঁদে-মুড়ি আর নারকেলের নাড়ু খাইয়েছেন।

অনেক রাত পর্যন্ত আড্ডা হয়েছিল।

আগে, মানে ডোডোবাবু, তাতাইবাবুর ছেলেবেলায় ওঁরা থাকতেন দক্ষিণ কলকাতার পন্ডিতিয়ায়। এখন তো পন্ডিতিয়া অনেক দূরে। তাতাইবাবুর বাবা-মা চলে এসেছেন সল্টলেকে। ওদিকে ডোডোবাবুরা উঠে গেছেন গড়িয়ায়, ফ্ল্যাটবাড়িতে।

রাতে দেরি হয়ে যাওয়ায় ডোডোবাবুকে বাড়ি ফিরতে দেননি তাতাইবাবুর মা। ডোডোবাবুর মাকে ফোন করে বলে দিয়েছিলেন। ডোডোবাবু রাত্রে তাতাইবাবুদের সল্টলেকের বাড়িতেই শুয়েছিলেন।

খুব ভোরবেলা উঠে ডোডোবাবু-তাতাইবাবু স্থির করলেন একবার পুরোনো পাড়ায় ঘুরে আসবেন। এখন ভিড়ভাট্টাও কম। পুরোনো লোকজনদের বাসায় পাওয়া যাবে।

ডোডোবাবুর গাড়ি বাড়ির সামনে সারারাত দাঁড় করানো ছিল। এখন সেটায় দুই বন্ধু উঠে পন্ডিতিয়ার দিকে রওনা হলেন।

হাজরার মোড় থেকে একটু চা-বিস্কুট খেয়ে পুরোনো পাড়ায় গেলেন। আগের থেকে পুজোর মন্ডপ অনেক বড় আকারের, তাতাইবাবুদের সময় দুর্গাপুজোর মন্ডপ এত বড় হত।

বিসর্জনের বাজনা বাজছে। মেয়েরা শাঁখ বাজাচ্ছে। একটু পরে বিসর্জনের মন্ত্র আরম্ভ হবে। ডোডোবাবু, তাতাইবাবু মঞ্চের কাছাকাছি আসলে রীতিমতো হইচই পড়ে গেল। সবাই এসে তাঁদের ঘিরে দাঁড়াল।

আরে, ডোডো-তাতাই ! পাড়ার লোকেরা রীতিমতো উত্তেজিত। এক বৃদ্ধ বললেন, আরে তোমরা তো বড় হয়ে গেছ ! ডোডোবাবু ফস করে বললেন, আমাদের বড় হওয়া অনেকদিন আগে শেষ হয়ে গেছে।

সবচেয়ে অবাক কান্ড ঘটল -- একটি পাঁচ-ছয় বছরের শিশু এসেছে। সে নিশ্চয়ই তার মা-বাবার কাছে ডোডো-তাতাইয়ের পুরোনো গল্প শুনেছে। সে ডোডো-তাতাইয়ের জামা ধরে ঝুলোঝুলি করতে লাগল -- এই যে ডোডোবাবু, এই যে তাতাইবাবু। ডোডোবাবু তিতিবিরক্ত হয়ে বললেন, ‘তুমি আবার কে ?’ অদমিতভাবে সে বলল, ‘আমাকে চিনবেন না। আপনারা চলে যাওয়ার পরে হয়েছি যে।’

৮
ভগবানের টর্চলাইট

সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। শুধু আজ সকাল থেকে নয়। গত কয়েকদিন হল সারা দিন-রাত কখনও ঝিরঝির করে, কখনও বেশ জোরে বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে।

আজ সন্ধ্যা থেকে তোড়ে বৃষ্টি চলছে। শুধু বৃষ্টির শব্দ, সঙ্গে হাওয়ার শোঁ শোঁ।

এরই মধ্যে ঢাকের বাজনা শোনা যাচ্ছে।

পুজো এসে গেছে। আজ নিশ্চয় পঞ্চমী। এবার বোধহয় পুজোতেও বৃষ্টি হবে।

রাত দশটা নাগাদ বৃষ্টি ও বাতাসের জোর আরও বাড়ল। খাওয়া-দাওয়া সেরে ডোডোবাবু একটা বই হাতে বিছানার পাশে বেতের চেয়ারে বসেছেন। তাঁর হাতে একটা ভূতের গল্পের সঙ্কলন, এই রকম সব দিনে ভূতের গল্প ভারী জমে।

এমন সময় ফ্ল্যাটে বাইরে বেরোনোর দরজায় খুব আওয়াজ করে প্রথমে কড়া বাজল, তারপরে ক্রমাগত থেমে থেমে কলিংবেলের শব্দ।

ভূতের গল্প পড়তে পড়তে, একটা আবেশের মধ্যে ছিলেন ডোডোবাবু, এই গল্পের ভূতটা তার ডান হাতটা যত ইচ্ছে লম্বা করতে পারে, বেলগাছের ডালে বসে একতলায় রান্নাঘরে উনুন থেকে মাছভাজা তুলে আনতে পারে।

কিন্তু এই মুহূর্তে ডোডোবাবুর ভাববার সময় নেই। কলিংবেল এবং দরজার কড়া নাড়া উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছেন।

ডোডোবাবু গিয়ে দরজা খুললেন।

ওই দুর্যোগে এ কে ?

গায়ে ম্যাক্সি কোট বা রেইন কোট, পায়ে গামবুট, হাতে গ্লাভস, ইনি কে ?

দরজা খোলার পরে ডোডোবাবুর সংশয় হয়েছিল, ইনি কোনও ভৌতিক চরিত্র।

কিন্তু তা নয়, ইনি স্বয়ং তাতাইবাবু। তাতাইবাবুকে চিনতে পেরে ডোডোবাবুর দেরি হওয়া সম্ভব নয়। শেষ কবে তাতাইবাবু কলকাতায় এসেছিলেন, অন্তত তিনবছর আগে।

বলা নেই, কওয়া নেই। এরকম বর্ষার রাতে হঠাৎ উদয়। তাতাইবাবু বললেন, 'প্লেন থেকে দমদমে নেমে দেখি জলে জলাকার। অবস্থা বুঝে এয়ারপোর্টে মালপত্র রেখে দুশো টাকা বখশিস কবুল করে একটা ট্যাক্সিওয়ালাকে নিয়ে বেরোলাম। ডোডোবাবু বললেন, 'বলো কী ?'

ঘরের ভিতরে ঢুকলে মেঝে জলে ভিজে যাবে। তাতাইবাবু গায়ের রেনকোটটা খুলছিলেন। ডোডোবাবুর কথায় বললেন, 'শহরে ঢুকতে পারিনি। বাইপাস দিয়ে এসেছি।'

এবার তাতাইবাবু পায়ের ভেজা জুতো খুলতে খুলতে বললেন, 'ঘুরে ঘুরে ই এম বাইপাস ধরে গড়িয়া হয়ে সন্তোষপুরের ভেতর দিকের একটা গলি দিয়ে ...'।

প্রচন্ড ঝলকানি দিয়ে সাংঘাতিক শব্দ করে কাছেপিঠে কোথাও একটা বাজ পড়ল। বিদ্যুতের আলোয় চারদিক দিনের আলোর মতো পরিস্কার দেখা গেল।

ডোডোবাবু তাতাইবাবু দুজনেই চমকে উঠেছিলেন। তাতাইবাবু বললেন, 'বাবা ! সারা পৃথিবীতে এমন বজ্রবিদ্যুৎ দেখিনি।' গর্বিতভাবে ডোডোবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'বিদ্যুৎ ব্যাপারটা কী জানেন ?' তাতাইবাবু বললেন, 'না।' এবার ডোডোবাবু বললেন, 'বিদ্যুৎ হল ভগবানের টর্চলাইট। মাঝে মাঝে অন্ধকারের মধ্যে আলো ফেলে দেখে নেয় জগৎটা কেমন আছে, আমরা কেমন আছি।'

ডোডোবাবুর মুখের কথা লুফে নিয়ে তাতাইবাবু ডোডোবাবুদের বাইরের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, 'আমি ভাল আছি।'

ডোডোবাবুও বাড়ির ভেতর ঢুকতে ঢুকতে বললেন, 'আমিও ভাল আছি।'

৯
ছোট বয়েসের ঝুলি

পুজোর সময় বাড়ি এসেছিলেন মাত্র চার-পাঁচদিনের জন্য। পুজোর মুখে একটা কাজ নিয়ে ব্যাঙ্কক এসেছিলেন তাতাইবাবু। তারপরে কলকাতায় ফিরে প্রায় জলবন্দি হয়ে পড়লেন প্রবল বৃষ্টিতে।

আসার দিনই জলভাসি লবণহ্রদে নিজের বাড়িতে যেতেই পারেননি। বহু পথ ঘুরে পুরোনো অভিন্ন হৃদয় বন্ধু ডোডোবাবুর বাড়িতে গভীর রাতে গিয়ে উঠেছিলেন। পরের দিন সল্টলেকে নিজের বাসায় চলে আসেন।

এরপরে ডোডোবাবুর সঙ্গে আর দেখা হয়নি। আজ ফিরে যাওয়ার দিন। সন্ধ্যাবেলা ব্যঙ্ককের প্লেন। ব্যাঙ্কক হয়ে যেতে হবে আমেরিকায় কর্মস্থলে। তাতাইবাবু সফল ব্যঙ্ক ব্যবসায়ী। বাইরের ঘরে বসে জিনিসপত্র গুছোচ্ছিলেন। হাসিমুখে ডোডোবাবু একটা চটের থলি নিয়ে তাতাইবাবুর পাশে বসে তাঁকে গোছানোয় সাহায্য করতে লাগলেন। গোছাতে গোছাতে বললেন, 'ব্যাঙ্কবাবু তাহলে আবার ব্যাঙ্ককের মুখে।'

তাতাইবাবু মালপত্র গোছাতে গোছাতে একটা গোছানো জবাব দিতে পারতেন। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল ডোডোবাবুর হাতের চটের থলিটা।

সেদিকে দৃষ্টিপাত করে তাতাইবাবু বললেন, 'থলের মধ্যে বেড়াল আছে নাকি ?'

ডোডোবাবু হেসে জবাব দিলেন, 'বেড়াল নয়, বেড়ালছানা আছে।'

তাতাইবাবু বললেন, 'মানে ?'

এরপরে ডোডোবাবু বললেন, 'আপনারা যখন আমাদের পুরোনো পাড়া ছেড়ে চলে আসেন আপনি তো তখন আমেরিকায়। আপনার মা আমাকে এই জিনিসগুলো দিয়েছিলেন রেখে দেওয়ার জন্য। আজ আপনাকে ফেরত দিতে এসেছি।'

ডোডোবাবু একটা একটা করে জিনিস বার করতে লাগলেন। তাতাইবাবু অবাক হয়ে দেখতে লাগলেন। একটা একটা করে জিনিস বেরোতে লাগল। একটা পুরোনো, ফাটা টেনিস বল। তাতাইবাবুর মনে পড়ল পাড়ার পেছনের মাঠে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ বছর আগে তিনি আর ডোডোবাবু। পুরোনো খেলার সঙ্গীদের কথা মনে পড়ল। হালকা বল, এই বলে ডোডোবাবু কত যে বাউন্ডারি, ওভার বাউন্ডারি করেছেন। ডোডোবাবুরও মনে পড়ল অনেক পুরোনো কথা। সেই যে একবার পাশের গলির বাদল নামে একটা ছেলে এই বলটা নিয়ে পালিয়েছিল, পরের দিন ডোডোবাবুর মাকে নিয়ে তাতাইবাবু আর ডোডোবাবু বাদলদের বাড়িতে গিয়ে এই বল উদ্ধার করে এনেছিলেন। বাদল হাতেনাতে ধরা পড়ে গিয়েছিল। সে তখন তাদের বাড়ির সামনে দেয়ালে বলটা ছুড়ে ছুড়ে প্র্যাকটিস করছিল। বলটা নিয়ে চলে আসার সময় বাদলের শুকনো মুখটা মনে পড়ছিল। সেই বাদল এখন পুলিশে কাজ করে। কোথায় যেন দারোগা হয়েছে। সে নিজেই এখন অনেক চোর ধরে।

ধীরে ধীরে থলির ভেতর থেকে একটা একটা করে জিনিস বেরোতে লাগল। কতকগুলো চেনা যায়, কতকগুলো চেনা যায় না। পেনসিল কাটার কল, লাল-নীল দেশলাই -- একটা কুকুরের বকলস। কুকুরটার কথা মনে পড়ে গেল। তার নাম ছিল গণেশ। কতকাল আগে গণেশ মরে গেছে।

একটা বয়েজ স্কাউটের স্কার্ফ। থলির একপাশে একজোড়া রাংতা মোড়া বাঁশের তলোয়ার কত যুদ্ধ যে তারা করেছে। হঠাৎ তাতাইবাবুর কী মনে হল, তাতাইবাবু একটা তলোয়ার ডোডোবাবুর হাতে দিয়ে বললেন, 'আসুন, এক হাত হয়ে যাক।'

ডোডোবাবু তাতাইবাবু তলোয়ার খেলতে লাগলেন, তাঁদের মুখে তলোয়ার খেলার মন্ত্র 'তামেচা-বাহেরা-শির-হুল-তামেচা-বাহেরা', বাঁদিক থেকে ডানদিক থেকে মাথার

দিকে পেটের দিকে অসি সঞ্চালন।

ভেতরের ঘর থেকে এঁদের গলার স্বর শুনে বাইরের ঘরে এসে তাতাইবাবুর মা এই দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে বললেন, 'বাক্স গোছানো ফেলে এসব কী হচ্ছে ?'

তাতাইবাবুর মায়ের গলায়ও যেন সেই পঁচিশ বছর আগের কণ্ঠস্বর।

১০
খেলাধূলা

অনেকদিন পরে এ বছর শীতের সময় তাতাইবাবু তিন সপ্তাহের ছুটি পেয়েছেন। সাহেব-মেমদের দেশে যেখানে তাতাইবাবুর চাকরি, সেখানে শীতকালে ছুটি পাওয়া কঠিন। স্থানীয় লোকেরা শীতে বিশ্বভ্রমণে বেরোয়, তখন ছুটি মেলে না।

এবার প্রায় দশ বছর পরে কলকাতায় ফিরে তাতাইবাবু খুব খুশি। শীতের কলকাতার শব্দগুলোই আলাদা। রাস্তায় জয়নগরের হাঁড়ি নিয়ে বেচতে বেরিয়েছে। দোকানে দোকানে নলেন গুড়ের সন্দেশ, দোকানের বাইরে রঙিন কাপড়ে ব্যানার লাগানো,

'ফুলকপির সিঙ্গারা
মটরশুঁটির কচুরি।'

কলকাতা থেকে কয়েক মাইল উত্তরে-দক্ষিণে এগিয়ে গেলেই সাতসকালে টাটকা ধোঁয়া ওঠে খেজুরের রস। রস থেকে ধোঁয়া উঠছে, এদিকে বাইরের কুয়াশার ধোঁয়া।

কলকাতায় আসার দুয়েকদিনের মধ্যেই তাতাইবাবু ডোডোবাবুকে নিয়ে একদিন তাঁদের পুরোনো পাড়ায় গড়িয়াহাটের কাছে পন্ডিতিয়ায় খুব ভোরবেলা উঠে চলে গেলেন।

ডোডোবাবু তাতাইবাবুরা যখন ছোট ছিলেন, বাঁশের বাঁকে বড় বড় হাঁড়ি ঝুলিয়ে

খেজুরের রস বেচতে আসাত কাকো, তিলজলার ভেতরের থেকে ; এক গেলাস রস দামমাত্র চার আনা (পঁচিশ পয়সা)। অমন সুস্বাদু পানীয় জগৎসংসারে পাওয়া যাবে না। এখন আর কলকাতায়-ও পাওয়া যায় না। অনেক খুঁজলেন ডোডোবাবু-তাতাইবাবু। এ পাড়ার পিছন দিকে গড়চায় একটা ভাঙা মসজিদ ছিল, সেই মসজিদটা এখনও আছে ; কিন্তু পাশের জমিটুকু আর খেজুর গাছগুলো নেই, একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।

পার্কের কিনারে একটা মাঠ ছিল, সেটা আয়তনে একটু কমে গেছে, কিন্তু এখনও আছে। কলকাতা শহরে ক্রমাগত নতুন নতুন বাড়ি উঠে প্রায় সব ফাঁকা জায়গাই দখল হয়ে গেছে, শুধু পাড়ায় পাড়ায় খেলার মাঠগুলো কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হলেও রক্ষা পেয়েছে।

মাঠটা দেখে ডোডোবাবু-তাতাইবাবুর অনেক কথা মনে পড়ল।

এই শীতল সকালবেলা মাঠটা প্রায় খালি। শুধু এক পাশে একটা বাঁশের বেড়া দেওয়া ভাঙা ঘর আছে, ওই ঘরেই ছোটবেলায় ডোডোবাবু, তাতাইবাবু এক্সারসাইজ যোগব্যায়াম শিখতে আসতেন। এসব কিছুই শেখা হয়নি। তবে দুজনাই শবাসন শিখেছিলেন, শবাসনের মতো আসন হয় না। চোখ বুঁজে চিৎ হয়ে ‘নট নড়ন-চড়ন-নট-ফট’ চুপচাপ শুয়ে থাকতে হয়, একেবারে যাকে বলে মড়ার মতো শুয়ে।

বলা বাহুল্য, বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় শবাসনের জন্যে কোনও প্রাইজ ছিল না। তবে ক্লাবের ছাপানো প্যাডে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছিল, সেই সার্টিফিকেটটায় রীতিমতো কঠিন ভাষায় লেখা হয়েছিল,

যোগব্যায়াম উৎকর্ষতার জন্য
এই শংসাপত্র প্রদত্ত হইল।

জীবনে অনেক মূল্যবান কাগজপত সার্টিফিকেট তাতাইবাবু পেয়েছেন এবং সেগুলো হারিয়েও গেছে। কিন্তু এই সার্টিফিকেটটা রয়ে গেছে। তাতাইবাবু জানেন, তাঁর পড়ার ঘরের পুরোনো কাঠের আলমারিটার কোথাও আছে।

ডোডোবাবুর অবশ্য মনেই পড়ে না এরকম কোনও সার্টিফিকেটের কথা।

১১
চড়ুইভাতি কিংবা বনভোজন

যাঁরা সাহেবদের দেশে থাকেন, মানে তাঁরা বিলেত-আমেরিকায় বসবাস করেন, তাঁরা অনেকেই বছরে একবার দেশে আসেন ছুটি নিয়ে। এখানে আত্মীয়-স্বজন, পুরোনো পাড়া, পুরোনো বন্ধুবান্ধব আছে দেখা সাক্ষাৎ হয়, পুরোনো এলাকায় যান, তারপর ছুটি শেষে পরিযায়ী পাখির মতো তাঁরা কর্মস্থলে ফিরে যান। বিলেত-আমেরিকা কাজের দেশ, জীবিকার দেশ। সেখানে ফিরতেই হয়।

তাতাইবাবুও প্রত্যেক বছরই একবার চেষ্টা করেন কলকাতায় আসতে। কলকাতায় ছোট শীত, নরম শীত। গরম নেই, ঠান্ডাও বেশি নয়। তা ছাড়া খেজুরে-গুড়, পিঠে পায়েস, ভেটকি মাছ আর গলদা চিংড়ি তার স্বাদই আলাদা। দামও বিলেতের তুলনায় অনেক অনেক কম।

কিন্তু দু:খের বিষয় সব বছর আসা হয় না, কাজের চাপ থাকে। তাতাইবাবু নিজেই একজন সংসারি মানুষ। তার নিজের দুটি সর্বাঙ্গ সুন্দরী মেয়ে রয়েছে, তাদের বাবা তাদের চোখের মণি। তা ছাড়া মেমসাহেব বৌ রয়েছে তাঁর, তাঁকে বড়দিনের উৎসবে দুই কন্যা ঘাড়ে চাপিয়ে, একা চলে আসা সম্ভব নয়।

এবার আসা হবে না বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু বড়দিন, নতুন বছর পার হয়ে জানুয়ারির মাঝামাঝি দিন সাতেকের ছুটি পাওয়া গেল, তাতাইবাবু মনে ইচ্ছে ছিল কলকাতায় আসার। মেয়েদের স্কুল খুলেছে। তাঁরা আসতে পারবে না কিন্তু তাতাইবাবুর মন উসখুশ করছে। এদিকে কলকাতায় তাঁর এক খুড়তুতো ভাইয়ের বিয়ে। কাকা অনেক করে লিখেছেন। মেমসাহেব তাতাইবাবুকে বললেন, ‘যাও ঘুরে এসো।’ মেয়েরা অবশ্য ভাল বুঝল না। হৈ হৈ করে এয়ারপোর্টে গিয়ে বাবাকে প্লেনে তুলে দিয়ে এল। তারপর তারা কী করবে ? সেটা তাদের মা সামলেছে। সে কথা এখানে থাক।

মাঘ মাসের গোড়ায় তাতাইবাবু কলকাতায় এসে পৌঁছলেন একদিন শেষ রাতে। ঠান্ডার দেশ থেকে তাতাইবাবু এলেন একটা হাফ হাতা সোয়েটার পরে, এসে দেখেন বিমানবন্দরে ওভারকোট পরে, মাফলার মাথায় বেঁধে ডোডোবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। ডোডোবাবু চিরকালই খুব শীতকাতুরে।

ডোডোবাবুকে দেখে তাতাইবাবুর খুব মজা লাগল, ডোডোবাবু তাঁকে কোনও শুভেচ্ছা জানানোর আগেই তিনি উল্টো করে তাঁকেই শুভেচ্ছা জানালেন, 'ওয়েলকাম টু এস্কিমো ল্যান্ড।'

সেই ছোটবেলার মতো ডোডোবাবু আবার খেপে গেলেন। তাতাইবাবুকে বললেন, 'আগে বাড়িতে চলুন, তারপর কে কাকে ওয়েলকাম করে দেখা যাবে। এখন দেরি করা যাবে না।'

এরপর দুই বন্ধু ডোডোবাবুর নতুন কেনা গাড়িতে চড়ে বিমানবন্দর থেকে বেরোলেন। গাড়িতে উঠেই ডোডোবাবু বললেন, 'চড়ুইভাতির জন্যে সবাই রওনা হবে বারোটার মধ্যে।'

চড়ুইভাতি ? তাতাইবাবুর মনে পড়ল, আসবার আগে ডোডোবাবু জানিয়েছিলেন, কাল দুপুরেই পুরোনো বন্ধুদের একটা পিকনিক হবে। আমেরিকাতেও পিকনিক হয়, কিন্তু সেখানে খিচুড়ি আর ফুলকপির বড়া হয় না। তাতাইবাবু খুব খুশি হয়েছিল। কিন্তু তাঁর কথায় তা বোঝা গেল না। তিনি ডোডোবাবুকে বললেন, 'আমেরিকায় ফোনে জানালেন পিকনিক, এখন বলছেন চড়ুইভাতি।' ডোডোবাবু বললেন, 'ঠাকুমা একে পৌষলা বলতেন, আর মা বলে বনভোজন।' তাতাইবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'সবই এক ব্যাপার !

১২
এবার শীতে কলকাতায়

মাত্র সাতদিনের জন্যে কলকাতায় এসেছিলেন তাতাইবাবু। এবারের ছুটিটা পুরোপুরি উপভোগ করেছেন। সঙ্গে চঞ্চলা কন্যাদুটি ছিল না, স্ত্রী ছিলেন না, ফলে যত ইচ্ছে যেখানে ইচ্ছে যাতায়াত করা গেছে, আড্ডা দেওয়া গেছে। পুরোনো বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা করা গেছে।

সর্বসময়ের দোসর ডোডোবাবু এই সাতদিনের জন্যে নিজের কাজকর্ম থেকে ছুটি নিয়েছিলেন। অনেকদিনের অনেক গল্প তাঁদের দুজনের মধ্যে। তাতাইবাবু প্রত্যেকবার এসে জিজ্ঞাসা করেন কলকাতায় এখন কী হচ্ছে।

আগে এরকম প্রশ্নের উত্তর ছিল সত্যজিৎ রায়ের ছবি, পিসি সরকারের ম্যাজিক, শ্যামবাজারের নাটক, পার্ক সার্কাস ময়দানে ও সিঁথির মোড়ে জেমিনি সার্কাস, অলিম্পিক সার্কাস।

আজকাল অবশ্য সার্কাসের আবেদন কম। বাঘ, সিংহ ইত্যাদি বন্যজন্তু প্রদর্শন করা যায় না। আর শিশু এবং কিশোর-কিশোরী সার্কাসের খেলায় আইনত নিষিদ্ধ। ফলে সার্কাসের খেলায় এখন আর সেই আকর্ষণ নেই। ভিড়ও কম হয়। তবে কলকাতার আশেপাশে আজকাল নানারকম প্রমোদ-উদ্যান গড়ে উঠেছে। সবই বিলেত আমেরিকার অনুকরণ। এগুলিতে টিকিটের দাম খুব চড়া। একশো-দেড়শো টাকা পর্যন্ত। পুরোনো সিনেমা থিয়েটারে সেও পঞ্চাশ টাকার বেশি।

ডোডোবাবুর কথামতো তাতাইবাবু দু-এক জায়গায় ঘুরলেন। আসলে তিনি খুঁজছিলেন সেই জায়গাগুলো মেয়েদের নিয়ে এলে সে সব জায়গা দেখাবেন -- দুর দুর সেরকম জায়গা কোথায় ? এখনও কলকাতায় শিশুদের জন্যে যাওয়ার জায়গা দু-একটা যাও আছে সে সবই তাতাইবাবুর আমলের। যেমন কলকাতা জাদুঘর, চিড়িয়াখানা, গঙ্গার তীর, পরেশ নাথের মন্দির, দক্ষিণেশ্বর, নাখোদা মসজিদ। দু-আনার মধ্যে ট্রাম-বাসে টিকিট কেটে তাতাইবাবুরা পুরোনো শহর ঘুরে ঘুরে দেখতেন।

ডোডোবাবু তাতাইবাবু এবারও চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু বাস-ট্রামে ভীষণ ভিড়। ট্যাক্সি পাওয়া এখন আর তত কঠিন না হলেও তার খরচ অনেক বেশি। তবে ডোডোবাবুর গাড়িটা ছিল যে গাড়িতে চড়েও ডোডোবাবু, তাতাইবাবু পুরোনো শহরকে কাঁথা সেলাইয়ের মতো এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে ঢুঁড়লেন।

তবে তাতাইবাবু 'দমদম বিমানবন্দর' থেকে আসার পথে সামান্য কয়েক কিলোমিটার রাস্তায় সল্টলেক পর্যন্ত টের পেয়েছিলেন কলকাতা ক্রমশ বাড়ছে, ভীষণভাবে বাড়ছে। বড় বড় আকাশ ছোঁয়া বাড়ি, বিশাল চওড়া রাস্তা একটা নতুন কলকাতা।

সব দেখেশুনে তাতাইবাবুর ভালই লাগল। পুরোনো ফেলে যাওয়া শহরের সঙ্গে কিছুদিন পরে কিছুই আর মিলবে না। সেই দু:খে হিন্দু-স্কুলের গেটে বুড়ো চাটওয়ালার কাছ থেকে আলুকাবলি কিনে খেলেন। যা ভয় পেয়েছিলেন তা নয়, পেটে তেমন কোনও গোলমাল হল না।

পরদিন মধ্যরাতে ফিরে যাওয়ার প্লেন। এয়ারপোর্টে দুই পুরোনো বন্ধু উষ্ণ করমর্দনের পরে ডোডোবাবু বললেন আপনার ভাগ্য খারাপ তাতাইবাবু। তাতাইবাবু বুঝলেন এর মধ্যে একটা গোলমাল আছে। মুখে বললেন আপনার মতো বন্ধু যার তার আর ভাগ্য খারাপ কী হবে ?

ডোডোবাবু হেসে বললেন সাত সাতটা দিন রইলেন, আপনার ভাগ্য খারাপ তাই সাত দিনের মধ্যে বাংলা বন্‌ধ কিংবা সামান্য অবরোধটুকুও হল না। আজকে আসবার পথে রাস্তায় আটকে যেতাম। এই মুহূর্তে সুটকেস হাতে রাস্তার পাশ দিয়ে ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে ছুটে আসতে হত।

১৩
ভিতুর ডিম

ভিতুর ডিম বলে একটা কথা আছে। তার মানে, সেটা কখনও খোলসের ভেতর থেকে বেরোতে পারত না। ভয়ে ডিমের মধ্যে গুটিয়ে থাকত। ডিম ফুটে কোনওদিন

সাহসী ছানা বেরোত না।

একটা গল্প বলি।

তাতাইবাবুদের গ্রামের বাড়ি এলাসিন নামে একটা গ্রামে। ঢাকা-কলকাতার স্টিমার তখন এখান থেকে যাতায়াত করে। পাটের ব্যবসার বড় গঞ্জ।

বহু নৌকো, লঞ্চ, স্টিমার, হোটেল, মিস্টির দোকান, এলাসিন স্টিমার ঘাট খুবই রমরমা।

তাতাইবাবুদের শহরের বাড়ি টাঙ্গাইলে। এলাসিন থেকে মাত্র দশ মাইল দূরে। আজকাল এলাসিন, টাঙ্গাইল এইসব মনে পড়লে এই চল্লিশ ছুঁই ছুঁই বয়সে তাতাইবাবু মাঝে মাঝে আপন মনে হাসেন। শুধু এলাসিন, টাঙ্গাইল কেন, পাশাপাশি আরও সব গ্রামের নাম ছিল -- গোমজানি, হিঙ্গানগর, ভুরভুরা, বেড়াপোসনা -- এইরকম সব।

অতএব পুরোনো কথা এখন এখানে বলে লাভ নেই। আমরা টাঙ্গাইল থেকে এলাসিন যাওয়ার পুরোনো গল্পটা বলি।

সেই সময়ে গ্রাম মফস্বলের দিকে যাতায়াতের কোনও ভাল ব্যবস্থা ছিল না। সেসব জায়গায় রেলস্টেশন বা স্টিমার ঘাট ছিল সেগুলোর কথা আলাদা। টাঙ্গাইল -- এলাসিনের দিকে যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল শীতকালে ঘোড়ার গাড়ি, বর্ষাকালে নৌকো। অত কাছাকাছির মধ্যে কেউ স্টিমারে উঠে যেত না।

প্রত্যেক বছর গ্রীষ্মের সময় যখন স্কুল ছুটি হত তাতাইবাবুরা গ্রামের বাড়িতে যেতেন। শেয়ালদা থেকে ট্রেন। এক রাত রেলযাত্রার পর পরদিন সকালে স্টিমারে নদীপথে টাঙ্গাইল পৌঁছনো। সেখান থেকে নৌকোয় করে এলাসিন যাওয়া।

সেবার ডোডোবাবু জোর করে তাতাইবাবুদের সঙ্গী হলেন। আগের বছরই মামাতো বোনের বিয়েতে বাংলাদেশ গিয়েছিলেন। পাসপোর্ট-টাসপোর্ট সবই ছিল। কিন্তু এবারে বাড়ির লোকদের ফেলে ট্রেনে উঠতেই ডোডোবাবুর মুখে কেমন কালো, অন্ধকার

ভাব।

আধো জাগা, আধো ঘুমে রাতটা কোনওমতে কাটালেন। পরদিন সারাদিন গেল স্টিমারে। বিকেলের দিকে একটা নৌকো ভাড়া করে এলাসিনের দিকে রওনা হলেন। কিন্তু রওনা হওয়ার আগেই শুরু হল দারুণ ঝড়বৃষ্টি। নৌকো ভীষণ কাঁপতে লাগল। ডোডো-তাতাইয়ের নৌকোর মাঝিরা বলল, এখন নৌকো ছাড়া যাবে না। নদীর চেহারা ভাল না। বাকি রাতটুকু নৌকোর মধ্যে কাটাতে হবে। মাঝিরা জলে নেমে একটা বিরাট স্টিমারের আড়ালে আশ্রয় নিল।

ঝড় আরও ভয়াবহ হয়ে উঠল। নৌকো প্রচন্ড দুলতে লাগল। ডোডোবাবু ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগলেন। মাঝিদের একটা কাঁথা জড়িয়ে ডোডোবাবু চোখ বুঁজে পড়ে রইলেন। তাতাইবাবু পাশে শুয়ে বললেন, 'ঘুমোনো ছাড়া কিছু করার নেই। ঝড়ের সময় নৌকোর দড়ি থেকে ছেড়ে দেবে, না হলে ধাক্কা লেগে ভেঙে যাবে। এরাও তাই করবে। আমরা চুপ করে পড়ে থাকি।' ডোডোবাবু থরথর করে কাঁথার মধ্যে কাঁপতে কাঁপতে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঝড় কোথায় নিয়ে যাবে কে জানে ?

একেবারে টানা ঘুম। শেষ রাতে পাখির ডাকে, হাঁসের কলস্বরে, কাকের চেঁচামেচি শুনে ডোডোবাবু তাতাইবাবু নৌকোর ছইয়ের নীচ থেকে বেরিয়ে এলেন।

বাইরে ভোরবেলার হালকা আলো। নদীর জল শান্ত, আকাশ পরিষ্কার। কোথাও কাল রাতের সেই ভয়াবহ ঝড়ের চিহ্ন নেই।

ডোডোবাবু ভয়ে ভয়ে একজন মাঝিকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা আমরা কোথায় এসেছি ? মাঝি বলল, কোথায় আবার ? টাঙ্গাইল শহরে। রাতে আর ছেড়ে যাওয়ার সাহস পাইনি। ডোডোবাবু অবাক হয়ে বললেন, তবে ? একজন মাঝি গলুই-এর ওপর বসে দাঁত মাজছিল। সে বলল, রাতে নৌকো খুঁটি পুঁতে বেঁধে রাখা হয়েছিল। না হলে দড়ি ছিঁড়ে একেবারে যমুনার চরে গিয়ে উঠত।

একটু পরে মাঝিরা নৌকো খুলে দিল। আর দূর নয়, দেরি নয়। ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে এলাসিন। সেই উত্তেজনা ডোডোবাবু আজও ভোলেননি।

১৪
কলকাতার গুন্ডা

সেই যে পাঁচ-ছ বছর বয়েসে ডোডোবাবু তাতাইবাবুর সঙ্গে জোর জবরদস্তি করে এলাসিন গিয়েছিলেন আজ এতকাল পরেও সেই স্মৃতি মোটেই ঝাপসা হয়ে যায়নি।

এলাসিনের সঙ্গে ডোডোবাবুর কোনও সম্পর্ক নেই। শুধু তাতাইবাবুর সঙ্গে বন্ধুত্বের দৌলতে জোর করে এখানে এসেছিলেন। এসে প্রথমে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে পড়ে রীতিমতো ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। তারপরে অল্প এক সপ্তাহের মধ্যে রীতিমতো বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল ওই এলাকার সঙ্গে।

একটা লোককে বিশেষ মনে আছে। এখানকার লোকেরা তাকে কলকাতার গুন্ডা বলে ডাকত। সে আগে কলকাতার রাস্তায় গুন্ডামি করে বেড়াত। ডোডোবাবু যখন শুনলেন লোকটা কালীঘাটের গুন্ডা ছিল ডোডোবাবু তার পতি একটা আত্মীয়তা অনুভব করেছিলেন হাজার হোক কালীঘাট তো কলকাতায়। তাঁদের বাড়ি পন্ডিতিয়ার পাশেই।

ডোডোবাবু গল্প শুনেছিলেন এই কলকাতার গুন্ডাকে কলকাতা পুলিশ ট্রেনে তুলে একেবারে শেষ সীমায় পাঠিয়ে দেয়। সেখান থেকে ছোট নৌকো করে নদীর এপারেই এই এলাসিনে নামিয়ে দিয়ে বলে, ভবিষ্যতে কোনওদিন তোমাকে যেন এদিকে না দেখি। তাহলে শেষ করে দেব।

সেই কলকাতার গুন্ডার শেষ করে দেওয়ার আর কিছু বাকি ছিল না। ডান এবং বাঁ পা ডাকাতি করে ধরা পড়ার পর সবাই মিলে মুচড়ে ভেঙে দিয়েছিল।

ডোডোবাবু তাতাইবাবুর ঠাকুমার কাছ থেকে চেয়েচিন্তে নাড়ু, মুড়কি, মোয়া, মুড়কি, এমনকী ঘরে বানানো সন্দেশ নিয়ে তাকে দিত। লোকটাকে মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে খুব ভাল লেগে গিয়েছিল ডোডোবাবুর। তিনি তাতাইবাবুকে বললেন, যে লোকটার কেমন মমতাভরা চোখ দেখেছেন। কেমন ছলছল চোখে তাকিয়ে থাকে। শুধু ডাকাত ভুল করে কলকাতার লোকেরা ওকে মেরেছে।

তাতাইবাবু অবশ্য ওই ডাকাতটার চোখে তেমন মায়ামমতা কিছু দেখতে পাননি। লোকটাকে দেখলেই তার মনে হত কি সাংঘাতিক ডাকাত। দুয়েকবার একটু দূর থেকে তাতাইবাবু লক্ষ করে দেখেছেন একটু আনমনা হলেই ওই লোকটির চোখে-মুখে কেমন হিংস্র ভাব ফুটে উঠছে। হঠাৎ হঠাৎ লোকটি বদলিয়ে যাচ্ছে। ব্যবহারে অবশ্য সেরকম খুব কিছু একটা টের পাওয়া যেত না।

দুয়েকদিনের মধ্যে ওই গুন্ডা লোকটি তাতাইবাবুদের বাড়ির মধ্যে আসতে যেতে লাগল। তাতাইবাবুর মাকে বৌদি এবং ঠাকুমাকে মা ঠাকরুন ডেকে বাড়ির মধ্যে যাতায়াত অনায়াস করে ফেলেছে।

তাতাইবাবুর ঠাকুরদার এই রকম একটি লোক বাড়ির মধ্যে ঢোকায় প্রবল আপত্তি ছিল ; কিন্তু তত দিনে ঠাকুমার মায়া জন্মে গেল ওই পঙ্গু মানুষটির ওপর।

অঘটন একদিন ঘটল।

একদিন গভীর রাতে মুখে চুনকালি মেখে হাতে বর্শা, লাঠি নিয়ে একদল লোক হারে রে করে তাতাইবাবুদের বাড়িতে ডাকাতি করতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বহু টাকা, গয়নাগাটি এবং অন্যান্য জিনিস এই ডাকাতেরা নিয়ে যায়।

এরকম ডাকাতি ওদিকে প্রায়ই হত। কেউই ডাকাতদের চিনতে পারেনি। কিন্তু ডোডোবাবু ঘুম-ভাঙা চোখে তাঁর বন্ধু ভিখিরি ডাকাতকে চিনতে পেরেছিলেন এবং পরের দিন সকাল থেকে কালীঘাটের ওই ডাকাতটিকে আর দেখতে পাওয়া যায়নি। পরে অবশ্য সকলেই বুঝতে পারে ওই লোক খোঁড়া ছিল না। উদ্দেশ্য সফল করার জন্য সেটা ছিল অভিনয়।

১৫

তিরিশ বছর আগেকার কথা

ডোডোবাবু-তাতাইবাবুরা এখন তাঁদের পুরোনো পাড়ায় দক্ষিণ কলকাতার পন্ডিতিয়ায় থাকতেন।

এই পন্ডিতিয়া রোডের পিছন দিকে গরচা। গরচায় অনেক মোটর গাড়ি সারানোর গ্যারেজ ছিল। তাতাইবাবুদের বাড়ির কাছেই ছিল মহারাজ মোটরস।

আসলে সেটা ছিল পুরোনো দিনের কোনও জমিদার বাড়ি। টিনের বড় আটচালা ঘর, উঠোন, পুকুর। গোয়ালঘর, আস্তাবল। গরু-ঘোড়া কিছু ছিল না। বিরাট কাঠের দরজা সব সময়েই বন্ধ থাকত। বাড়ির ভেতরটা কেউ দেখতে পেত না।

বাড়িটার উঠোনে পুকুর পারে কয়েকটা ছোট-বড় আম-কাঁঠাল গাছের পিছনে ছিল একটা প্রাচীন তেঁতুল গাছ। প্রচুর তেঁতুল পেকে মাটিতে পড়ে থাকত।

ডোডোবাবুর মনে আছে। তাতাইবাবুরও আবছা আবছা মনে আছে, তেঁতুলগুলো খুব মিষ্টি ছিল না কিন্তু খুব একটা স্বাদের ছিল।

এই গ্যারেজে ভিতরে ডোডোবাবু-তাতাইববুর প্রবেশাধিকার ছিল না। তবে পাড়ার ছেলে বলে দেয়ালের আশপাশ থেকে পাকা তেঁতুলের ছড়া কুড়িয়ে আনতেন। সেগুলো সাধারণত পাড়ার কাকগুলো ঠুকরিয়ে ঠুকরিয়ে গাছ থেকে মাটিতে ফেলত। সে বয়েসে তাঁদে বাছ-বিচার ছিল না, রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে জল দিয়ে ধুয়ে নিতেন। এই পাকা তেঁতুলের গন্ধেই হঠাৎ এক বছর কোথা থেকে হনুমানের দল এল।

কাছাকাছির মধ্যে পুব দিকে রেললাইন পেরিয়ে বন্ডেলের দু-পাশে হনুমানের বসতি ছিল, তারাই পাকা তেঁতুলের গন্ধে গন্ধে রীতিমতো মিছিল করে হাজরা রোড ধরে এই মোটর গ্যারেজের তেঁতুল গাছ পর্যন্ত চলে আসত।

এরপর যতদিন গাছে তেঁতুল ছিল হনুমানের দল একেবারে শেষ রাতে ওই গ্যারেজে চলে আসত। তেঁতুল গাছ লুটপাট লন্ডভন্ড করে সন্ধ্যায় তাদের বাসায় চলে যেত।

তেঁতুল ফুরিয়ে এল, এবার তাদের লোকের বাড়িঘরের ওপর নজর পড়ল। রান্নাঘর থেকে ডাল-ভাত চুরি করে খেতে লাগল। ঘটি-বাটি নিয়ে পালাতে লাগল। সবচেয়ে সাংঘাতিক কথা। পাড়ায় হরিমন্দিরের বারান্দা থেকে ভক্তদের জুতো চুরি করতে লাগল।

অবশেষে ভয়ানক ব্যাপার হল, ডোডোবাবুর চোখ থেকে এক ঝটকায় তাঁর চশমাটা গালে এক থাপ্পর মেরে কেড়ে নিল। বিশালকায় গোদা হনুমান, লাঠি-ছাতা তুলে কত ভয় দেখানো হল, দুধ-কলা দিয়ে লোভ দেখানো হল, সে কিন্তু ঠিক মানুষের মতো চশমা চোখে দিয়ে কোথায় চলে গেল। অন্য হনুমানেরাও এরপরে পাড়াছাড়া।

তারপর সে যে কতদিন হয়ে গেছে। আজ প্রায় তিরিশ বছর তাতাইবাবুর বিকেলে এই হনুমানের কথা তার মনে পড়ে না। কিন্তু ডোডোবাবু কলকাতায় আছে। আজও কখনও পুরোনো পাড়ায় গেলে সেই হনুমানের কথা মনে পড়ে। সেই গ্যারেজটা উঠে গিয়েছে, তেঁতুল গাছটা নেই। সেখানে এখন দশতলা বাড়ি।

১৬
সাইকেল

তিরিশ বছর আগের ঘটনা।

তাতাইবাবুর তখন আট বছর বয়স। ডোডোবাবু তাতাইবাবুর থেকে এক বছরের ছোট তার মানে মাত্র সাত বছর হয়েছে।

তখনও তাঁরা শৈশব সম্পূর্ণ পার হয়েছেন, এমন কথা বলা যেত না। তবে হয়তো হিসেব-টিসেব করে বালক বা কিশোর বলা চলে।

তা, এই সময়ে তাতাইবাবু তার জ্যাঠতুতো দাদার কাছ থেকে তার নিজের পুরোনো সাইকেলটা উপহার পেলেন। পুরোনো তবুও তাই বা কম কি ?

সাইকেলটা পেয়ে তাতাইবাবু আনন্দে উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। তাতাইবাবুর জ্যাঠতুতো দাদা যার ডাক নাম ফুচু, যিনি এখন পুলিশের বড় কর্তা।

ফুচুদা তাতাইবাবুকে খুব ভালবাসতেন। মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করেছিলেন। তখন পরীক্ষায় ভাল ফল করা এখনকার মতো সহজ ছিল না, গন্ডায় গন্ডায় লেটার-স্টার সবাই পেত না। ফুচুদা তিনটে লেটার, দুটো স্টার পেয়েছিলেন।

ফুচুদার মামার বাড়িতে বুড়ি দিদিমা তখনও বেঁচে ছিলেন। তিনি স্নেহের নাতির পরীক্ষার ফল শুনে আনন্দিত হয়ে নিজের জমানো টাকা থেকে একটা নতুন সাইকেল কিনে স্নেহের ফুচুকে পাঠিয়ে দিলেন।

ফুচুদা তো নতুন সাইকেল পেয়ে খুশিতে ঝলমল করে উঠলেন এবং উত্তেজনার মধ্যে পুরোনো সাইকেলটি সবচেয়ে প্রিয় খুড়তুতো ভাই তাতাইবাবুকে দিয়ে দিলেন।

এই অস্বাভাবিক সৌজন্যে তাতাইবাবু আত্মহারা হয়ে গেলেন। পরদিন শেষ রাতে পন্ডিতিয়া রোডের পিছনের মোটামুটি শূন্য গলিতে সাইকেল চড়া প্র্যাকটিশ শুরু করলেন। একটু বেলায় ঘুম থেকে উঠে ডোডোবাবু এসে তাতাইবাবুকে বাসায় না পেয়ে বাড়ির পিছনের গলিতে পেয়ে গেলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে একটি বিশালকায় তবে শান্ত স্বভাবের ষাঁড়ের সঙ্গে সংঘর্ষে এড়াতে গিয়ে ভূমিশায়িত হয়েছেন তাতাইবাবু।

তাতাইবাবুর আকস্মিক পতনে সন্ত্রস্ত হয়ে ষাঁড়টি দ্রুত পদে গলি ত্যাগ করে। ডোডোবাবু এদিকে গিয়ে ধুলো-টুলো ঝেড়ে তাতাইবাবুকে উঠিয়ে দেন। তাতাইবাবু খুশি হন, খুশি হয়ে ডোডোবাবুকে বলেন, ‘গাড়ি চালানো শিখছি, ফুচুদা সাইকেলটা দিয়েছে। আমার শেখা হলেই আপনাকে শিখতে দেব। তবে আপনাকে লুকিয়ে শিখতে হবে, ফুচুদা বলে দিয়েছে, অন্য কেউ যেন না চড়ে।

এরপর তাতাইবাবু সাইকেল চড়া শিখতে লাগলেন। ডোডোবাবু সাহায্য করতে লাগলেন। কিন্তু সাহায্য করা অসম্ভব। প্রত্যেকবারই সিটের ওপর বসেই তাতাইবাবু যেই প্যাডেলে পা চালনা করেন, সরাসরি সাইকেলটা যে দিকেই হোক ঘুরপাক খেয়ে ডোডোবাবুর ওপর উঠে যায়। সাইকেলের একদিকে ডোডোবাবু অন্যদিকে তাতাইবাবু ধুলোয় গড়াগড়ি। প্রথম প্রথম ডোডোবাবুর সন্দেহ হয়েছিল, তাতাইবাবু ইচ্ছে করে এরকম করছেন কিনা। পরে বুঝতে পারলেন তাতাইবাবুর আনাড়ি হাত বার বার তার ঘাড়েই সাইকেল তুলে দেয়।

সেই যে ডোডোবাবুর মনে ভয় ধরে গেল সাইকেল চড়ার ব্যাপারে, জীবনে আর সাইকেল চড়া শেখা হয়নি।

১৭
মন খারাপ। মন খারাপ।

যে বয়েসে মানুষের মন খারাপ হয়, ডোডোবাবু-তাতাইবাবু সে বয়সে পৌঁছননি।

কিন্তু তাতে কি আসে যায়, ডোডোবাবু-তাতাইবাবু যে একটু পাকা সে তো সবাই মোটামুটি জানেন।

অবশ্য তাঁদের মন খারাপের ব্যাপারগুলো একটু অন্যরকম -- যেমন আজকাল আর বড় বড় সাদা বাতাসা পাওয়া যায় না কিংবা টোপাকুল কেন গ্রীষ্মকালে পাওয়া যায় না।

ওভাবে দু:খচর্চা করতে করতে ডোডোবাবু-তাতাইবাবু নিজেদের ছড়িয়ে এবার আশপাশের দিকে নজর দিয়েছেন।

রাস্তাঘাটে লোক দেখে বাছাই করে নিয়ে তার মধ্যে দু:খী-দু:খী মনখারাপ চেহারার লোক বাছাই করে তাকে ঘিরে দু:খ প্রকাশ করা --

যে কোনও অচেনা লোককে জড়িয়ে ধরে ডোডোবাবু-তাতাইবাবুর কি আফসোস --

'আহা! গজগোপাল এবারও ফেল করল। গজকে সিধে করে, ফেল করার মজা দেখিয়ে দেব।'

অপরিচিত ভদ্রলোক রীতিমতো অবাক। কে গজগোপাল, সে কি পরীক্ষা দিয়ে ফেল করেছে, তার জন্যে এরা কারা হা-হুতাশ করছে।

কালীমন্দিরের বারান্দায় এক বৃদ্ধ চোখ বুঁজে কি প্রার্থনা করছিলেন। ডোডোবাবু-তাতাইবাবু সেখানে উপস্থিত হয়ে বৃদ্ধ ভদ্রলোককে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন, 'ভুলে যান, যা গেছে তা গেছে, সে আর আসবে না বরং আজকের কথা ভাবুন, আমরা তো আছি, আমাদের কথা ভাবুন।'

এরপরে আর সেই বুড়ো ভদ্রলোক সহ্য করতে পারেননি, চোখ খুলে সামনে দুই মূর্তিমানকে দেখে তাদের চুলের মুঠি ধরে খুব করে ঝাঁকিয়ে দিয়েছিলেন। চুলের মুঠির গোড়ায় সেই টান ডোডোবাবু-তাতাইবাবু জীবনে ভুলতে পারেননি।

অবশ্য ‘মন খারাপ মন খারাপ’-এর পরিণতি ভয়াবহ।

ছুটির দিন। ঘোর গ্রীষ্মকাল। ডোডোবাবু-তাতাইবাবুদের বাড়ির কাছেই কলকাতায় বিখ্যাত লেক, রবীন্দ্র সরোবর।ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক হয়ে ট্রাম লাইন পার হয়ে নাক বরাবর যেতে।

জলের মধ্যে প্রায় ঘন্টাদুয়েক লাফঝাঁপ করে ওঁরা দুজন যখন বাড়ি ফিরছেন, গায়ের চামড়া কুঁচকে সারা। গরমের দিনে হলেও একটু কাঁপুনি। ওঁদের সামনে একটু দূরে একজন স্নান করে ফিরছেন। ভদ্রলোককে পিছন থেকে দেখা যাচ্ছে না। তিনি ধুতির ভেজা খুঁট গায়ে জড়িয়ে তাড়াতাড়ি হেঁটে যাচ্ছেন। হঠাৎ ডোডোবাবু-তাতাইবাবু স্থির করলেন ‘মন খারাপ’ খেলাটা তাঁরা খেলবেন এই ভদ্রলোকের সঙ্গে।

যে কথা সেই কাজ। পিছন থেকে ডোডোবাবু ভদ্রলোককে জাপটিয়ে ধরলেন। তাতাইবাবু বললেন, ‘এবার আর ছাড়ছি নে। বহুদিন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন দাদা।’ ‘কে রে বদমাশ’ বলে ভদ্রলোক ঘুরে দাঁড়াতেই ডোডোবাবুদের মাথায় বজ্রাঘাত, আরে এ যে স্বয়ং হেডমাস্টার মশায়। ‘দে ছুট দে ছুট’, সেই থেকে ডোডোবাবুরা ‘মন খারাপ, মন খারাপ’ খেলাটা ছেড়ে দিয়েছেন।

১৭
ঐতিহাসিক কান্ড

ডোডোবাবু, তাতাইবাবু দুজনের নানারকম বদবুদ্ধি ছিল। একবার তাঁরা একটা ঐতিহাসিক কান্ড করেছিলেন।

দেশপ্রিয় পার্কের পূর্ব প্রান্তে একটা কোণায় তাঁরা একটা ছোট জায়গা তাঁদের

নিজেদের এলাকা বলে মনে মনে ঠিক করে নিয়েছিলেন। অন্য ছেলেমেয়েরা খেলতে এলে তাঁদের এলাকার মধ্যে কাউকে ঘেঁষতে দিতেন না। বিভিন্ন ধরনের কাজ-কারবার তাঁরা ওখান থেকে চালাতেন।

অনেকদিন পরে তাতাইবাবু এবার কলকাতায় এসেছেন। প্রায় সপ্তাহ তিনেকের বড় ছুটি।

অনেকদিন আগেই এই সময়টায় দেশপ্রিয় পার্কে ছোটখাটো সার্কাস হত। সেখানে প্রধান আকর্ষণ ছিল হনুমানের ডিগবাজি। মাত্র একবার একটা পাকা কলা দিলেই হনুমানটা লাফ দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে দাঁড়াত। এখন সেই প্রদর্শনী আসে না।

সবশেষ বড় প্রদর্শনী দেখেছেন পার্কসার্কাস ময়দানে। হনুমানের খেলা ছাড়াও বড় অ্যালসেশিয়ান কুকুরের পিঠে উঠে ছাগলেরা সামনের পা তুলে সবাইকে নমস্কার করে খেলা দেখাত।

আরও কত কিছু হরেক রকম খেলার মজা ছিল। সেই সময়ে ডোডোবাবু, তাতাইবাবু অবাক হয়ে সেইসব খেলা দেখতেন।

সে যাই হোক, তাতাইবাবু ফিরে আসার পরে ডোডোবাবু কয়েকদিনের ছুটি নিলেন। অনেকদিন পরে শীতের রোদে ঠান্ডা বাতাসে দুজনে দুটি সোয়েটার গায়ে দিয়ে ছোটবেলার মতো শহরে চরকি পাক খেতে লাগলেন। সেই সময়েই ডোডোবাবু আবিষ্কার করলেন হাজরা মোড়ের কছে একটা ছোট পার্কে এক কোণায় 'দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান সার্কাস।'

একটা কুকুর কতদিন বাঁচে ? হাজরা পার্কের কাছে ছোট একটা ঘেরা দেওয়া জমিতে ডোডোবাবু হঠাৎ দেখতে পেলেন একটা বুড়ো কুকুর। দেখে মুখটা কেমন চেনা মনে হল।

তখন তাতাইবাবু কিছু বলার আগেই ডোডোবাবু বলে উঠলেন, 'আরে এটা তো আপনাদের সেই কুকুর বাঘা নয় ?'

তাতাইবাবু অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। বললেন, 'সত্যিই তো। তবু অবাক মনে হচ্ছে। এতদিন পরে এটা এখানে এল কী করে ?'

তাতাইবাবু আর ডোডোবাবু খুব উত্তেজিত হয়ে কুকুরটার চারপাশে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন। এই সময়ে কুকুরটাও তাঁদের দুজনকে দেখে খুব উত্তেজিত আহ্লাদিত হয়ে পড়েছে।

লোহার খাঁচার মধ্যে ঘুরে ঘুরে সে ঘেউ ঘেউ করছিল।

সার্কাসের ম্যানেজার, সেই আবার গেট কিপার কাছেই দাঁড়িয়েছিল। তাতাইবাবু তার কাছে গিয়ে কুকুরটার মাথাটা হাতে নিয়ে ডোডোবাবুকে বললেন, 'ওর জন্যে একটু বিস্কুট নিয়ে আসুন তো। মনে আছে ও সার্কাস বিস্কুট খেত ?'

ডোডোবাবু গিয়ে দু'টাকা দিয়ে তিনটে সার্কাস বিস্কুট কিনে আনলেন।

পুরোনো দিনের ডোডোবাবুর সেই কুকুর বাঘার মতো সঙ্গে সঙ্গে বিস্কুটগুলি খেয়ে ফেলল। তাতাইবাবু বললেন, 'ও তো মনে হচ্ছে সেই আমাদের পুরোনো কুকুরটাই।' এই বলে কুকুরটার মাথায় হাত দিয়ে গলা চুলকিয়ে খুব ঘনিষ্ঠভাবে কুকুরটাকে দেখতে লাগলেন।

কিন্তু হঠাৎ কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কুকুরটা ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো করে উঠল। গলার মোটা শেকলটা ঝাঁকিয়ে দিয়ে যেন ছিঁড়ে ফেলবে। এইভাবে তাতাইবাবুর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি ডোডোবাবু, তাতাইবাবু পেছন দিকে সরে এলেন। তখন সার্কাসের ম্যানেজার বললেন, 'আপনারা খুব বাঁচা বেঁচে গেলেন। এই কুকুরটা জেলখানার হাসপাতালের কুকুর।'

ডোডোবাবু বললেন, 'তাহলে তো খুব বেশি কাছে গেলে কুকুরটা আমাদের আক্রমণ করতে পারত ? নিশ্চয় অসুস্থ কুকুর।' তখন ম্যানেজার বললেন, 'হাসপাতাল থেকে জমাদাররা নিয়ে এসে পার্কের মধ্যে ছেড়ে দিয়েছিল।'

তাতাইবাবু বললেন, ‘অচেনা কুকুর কামড়ালে বিষ হতে পারত।’ সার্কাসের ম্যানেজার হাত জোড় করে বললেন, ‘হুজুর মাপ করে দিন। কালকেই ওটাকে কুকুরের হাসপাতালে দিয়ে আসব।’

ডোডো আর তাতাই বিষন্ন মনে পার্ক থেকে ফিরলেন? কুকুরটা পার্কে পড়ে রইল।

ফিরতে ফিরতে তাতাইবাবু ডোডোবাবুকে বললেন, ‘আমেরিকা ফেরত যাওয়া আগে খোঁজ করতে হবে কুকুরটার সত্যি কী হল।’

ডোডোবাবুকে তাতাইবাবু বললেন, ‘খুব সাংঘাতিক ব্যাপার। আপনাকে খবর রাখতে হবে সার্কাসওলা কী করল।’

সমাপ্ত

||মূর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত||ই-বুক||

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
Suman_ahm@yahoo.com